***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's***
*Volume –2, Issue-II, published on April 2022, Page No. 204–214*
*Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com*
*e ISSN : 2583 – 0848 (Online)*

# চণ্ডীমঙ্গল : দু'ই বিপরীত সমাজের সার্থক প্রতিফলন

অনিন্দিতা চ্যাটার্জি
স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী
ই-মেইল: ac3872763@gmail.com

## Keyword
সমাজ, বৈপরীত্য, কালকেতু, ফুল্লরা, দেবী চণ্ডিকা, ধনপতি, খুল্লনা, দারিদ্র্য

## Abstract
মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রধান ও অন্যতম শাখা মঙ্গলকাব্যে দেবদেবীদের মাহাত্ম্য কীর্তন করাই কবিদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এখানে মানব মনের প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস আভাসিত হয়েছে। যে ধর্মবিশ্বাস আবার নিয়ন্ত্রিত হয়েছে ভয় থেকে। সভ্যতার আদিপর্বে মানুষ প্রাকৃতিক শক্তি এবং হিংস্র জন্তুদের ভয় পেয়েছে, খুঁজেছে পরিত্রাণের উপায়। এই ভয় থেকেই দেবদেবীর নানারূপ মানুষ কল্পনা করেছে, চেষ্টা করেছে তাকে তুষ্ট ও প্রসন্ন করে জীবন অস্তিত্বের প্রবহমান ধারাকে নির্বিঘ্ন করতে। এই তুষ্ট করার কাহিনি দেবদেবীদের মাহাত্ম্যরূপে প্রচার করতে চেয়েছে। পৌরাণিক পরিকাঠামোকে অবলম্বন করে মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আনন্দ নিয়ে যে দৈনন্দিন জীবন তারই প্রকাশ ঘটেছে। সেই সূত্রে সমাজ ও সামাজিক বৈপরীত্য মঙ্গলকাব্যে বিশেষত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে দু'ই বিপরীত সমাজের প্রতিফলন ঘটেছে।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের 'আখেটিক খণ্ডে' বর্ণিত সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে ঐ একই কাব্যে 'বণিক খণ্ডে' বর্ণিত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তর পার্থক্য বিন্যস্ত হয়েছে। দরিদ্র ব্যাধজীবনের সঙ্গে ধনী বণিকদের জীবনযাপন একরকমের হবে না এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু এই বৈপরীত্য 'চণ্ডীমঙ্গল' পূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্য ধারায় এতটা স্পষ্টভাবে ধরা পড়েনি। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে দুইখণ্ডের দুই সামাজিক ভিন্নস্তরের দীর্ঘ বর্ণনার মধ্যে কবির জীবন অভিজ্ঞতার স্পষ্ট প্রভাব না থাকলেও কিছু কিছু রূপকের মাধ্যমে নিজ জীবন অভিজ্ঞতার পরোক্ষ প্রভাব নিপুণ দক্ষতায় তাঁর রচনার মধ্যে নিবিষ্ট করেছেন। যা কাব্যরচনার ক্ষেত্রে এক ভিন্ন মধ্যযুগীয় সমাজপ্রেক্ষিতের নবনির্মাণ।

কাহিনি বিস্তারে মুকুন্দ চক্রবর্তী সামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তি সরূপ দেবীর কাছে পশুদের দুঃখ নিবেদন, দেবীর অভয় প্রদান, দেবীর পরিকল্পনায় অরণ্যের পশুশূন্যতা, অন্নাভাব ক্লিষ্ট কালকেতুর দুশ্চিন্তা, খেদ, অভাবের সংসার পরিচালিকারূপে ফুল্লরার খেদ, শ্রমের বিনিময়ে ধনলাভের ঘটনা এবং স্থান পেয়েছে কালকেতুর চরিত্র বিশ্লেষণ। এখানে চরিত্র বিশ্লেষণ অপ্রাসঙ্গিক হলেও তার বাল্যক্রীড়া, কালকেতু – ফুল্লরার সংসার চিত্র বর্ণনায় দরিদ্র ব্যাধ সমাজের নানা সমস্যা ও যন্ত্রণার কথা এখানে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। ফুল্লরার বারমাস্যার নিদারুণ অভাবের চিত্র আলোচনাও মর্মস্পর্শী।

দ্বিতীয় খণ্ড অর্থাৎ 'বণিক খণ্ড' র কাহিনি শুরু হয়েছে 'চতুর্থ দিবসে'র নিশা পর্যায়ে। 'বণিক খণ্ডে' বণিকরা ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বারা ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি করেছে। নিজের দেশকেও সমৃদ্ধ করেছে। 'বণিক খণ্ডে' ব্যবসা বাণিজ্যের বর্ণনা, ধনপতির বিলাসী অবকাশ যাপন, ধনপতির ও খুল্লনার বিবাহ, সুশীলার বারোমাস্যা, শ্রীপতির দ্বিতীয় বিবাহ সর্বত্র স্থান পেয়েছে বিলাস ও প্রাচুর্যের চিহ্ন।

দু'ই খণ্ডের সমাজপ্রেক্ষিত সম্পূর্ণ ভিন্ন। দু'ই বিপরীতধর্মী সমাজ সার্থকভাবে দু'টি খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর লেখনীতে। কবি তার অন্তর্দৃষ্টি, গভীর পর্যবেক্ষণ ও অসাধারণ পরিমিত বোধের দ্বারা বৈপরীত্য, বৈষম্যকেও সমতায় গেঁথেছেন। তাই কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্য ধারায় ভিন্নধর্মী সার্থক সৃষ্টি রূপে বৈপরীত্যের সমতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে।

## Discussion

সমাজে উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের স্তরভেদ আদি মধ্যযুগের বিভিন্ন কাব্যে দেখা যায়। নিম্নবিত্তরা সংখ্যায় বিশাল প্রকৃতির। এরা তীব্র তাড়নার আড়ালে নীচু হয়ে থাকা কর্তৃত্ব ও আধিপত্যবাদে আটকে থাকে। এই নিম্নবিত্ত ও উচ্চবিত্ত উভয়ের সমাজপ্রেক্ষিতও ভিন্ন। মানুষের জীবনচর্যার বহিরঙ্গের বিশ্লেষণ ইতিহাস চেতনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও অন্তর্লোকের খুঁটিনাটি কিন্তু সাহিত্যেই ধরা পড়ে। মুকুন্দ চক্রবর্তী 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে শুধু 'বণিক খণ্ড' নিয়েই তার সাহিত্যের ডিঙা ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন মন্ত্রহীন ব্রাত্যদের মহিমা ও সমাজ প্রেক্ষাপটে অনস্বীকার্য।

সাহিত্যে দেশের অবস্থা, জাতীয় চরিত্র এবং জীবন অভিজ্ঞতা, কল্পনা– দেশকালের ইতিহাসের ধারায় স্নাত এবং বিশেষভাবে সমাজের প্রভাব যুক্ত। কাব্যকাহিনির সমাজ ও দেশকালের ইতিহাসের প্রভাবে প্রভাবিত হবে এটাই স্বাভাবিক। কারণ কবি তাঁর সমকালকে কখনোই অস্বীকার করতে পারেন না। তাই দেশকাল, ইতিহাস ও ব্যক্তিসংযোগের উদাহরণ সরূপ কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে নিজের অবস্থানের প্রকাশকে দু'ই ধরনের সমাজ বর্ণনার দ্বারা বিন্যস্ত করেছেন। এছাড়াও দীর্ঘতর আলোচনায় সূক্ষ্মভাবে চারটি শ্রেণির উল্লেখ থাকলেও সংক্ষিপ্ত আলোচনায় স্থূলভাবে দু'টি খণ্ডে দু'টি সমাজব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন।

যুগ ধর্মের অনুপ্রেরণায় কবিমানসে প্রত্যক্ষ নিষ্ঠুরতার তীক্ষ্ণতা এবং সমাজচেতনার সুদূরবিস্তারী প্রভাব পড়ে। যা অলৌকিক কাহিনির মধ্যেও লৌকিক সংসার জীবনের প্রতিবিম্ব চিত্রায়নে কবির আগ্রহকে উৎসাহ দেয়। সমকালীন সমাজচেতনার এই অনস্বীকার্য প্রভাব পরিলক্ষিত হয় কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর দু'ই খণ্ডের দু'ই বিপরীত সমাজ বর্ণনায়। মুকুন্দ চক্রবর্তী রচিত 'চণ্ডীমঙ্গল' এর 'আখেটিক খণ্ডে' নিদয়ার সাধভক্ষণ, গর্ভবেদনা, কালকেতুকে নিয়ে তার শৈশব, বিবাহ, জীবনসংগ্রাম, ব্যাধবৃত্তি, অভাব-অনটন যেখানে স্পষ্ট। পাশাপাশি 'বণিক খণ্ডে' বণিকরা ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা ধনসম্পদে সমৃদ্ধ হয়েছেন। নিজের জাতিকেও বাইরের দেশেও প্রতিষ্ঠিত করেছে। বণিক সমাজের চিত্র বর্ণনায় সমাজে নারী-পুরুষের অবস্থান, সতীন সমস্যা অপেক্ষা সামাজিক বৈভবকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন কাহিনির রচয়িতা। ধনপতির রাজার অনুগ্রহলাভ, ধনপতির পায়রা ওড়ানোর কথা, ধনপতির সঙ্গে খুল্লনার বিবাহের আতিশয্য, এমনকি সুশীলার বারোমাস্যাতেও দুঃখ অপেক্ষা বৈভব ও প্রাচুর্যের উপাদানকে বেশি তুলে ধরা হয়েছে।

কৃষিনির্ভর অর্থনীতি, শিকার কেন্দ্রিক ব্যাধজীবন, এক ব্যাধের অর্থপ্রাপ্তি আর অন্যদিকে বাণিজ্যকেন্দ্রিক অর্থনীতি, বণিকদের বৈভব প্রতিপত্তির দুই ব্যতিক্রমী সমাজ ব্যবস্থা 'চণ্ডীমঙ্গল'-এ বিদ্যমান। 'বণিক খণ্ডে'ও প্রচুর ঘটনার ঘটঘটা ও চরিত্রগুলোর মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল কিন্তু তা' ছিল বৈভবের আড়ালে। আর 'আখেটিক খণ্ডে' সুখানুভূতি ছিল দারিদ্র্যের প্রতিবিম্বে। এই দুই বৈপরীত্য অসাধারণ নিপুণ দক্ষতায় রচনা করেছেন কাব্য রচয়িতা।

কবি নিজে ডিহিদার মামুদ সরিপের অত্যাচারে বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামের পৈতৃক নিবাস পরিত্যাগ করে মেদিনীপুর জেলার আড়রা গ্রামে ব্রাহ্মণ জমিদার বাঁকুড়া রায় ও তার পরিবারের আশ্রয় গ্রহণ করা পর্যন্ত বর্ণনা 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ' অংশে করেছেন –

*"ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদে লোল ভৃঙ্গ*
*গৌড়বঙ্গ উৎকল মহীপ*
*অধর্মী রাজার কালে প্রজার পাপের ফলে*
*খিলাত পাইল মামুদ সরিপ।"*[১]

ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার ফলে কবি অনেক ক্ষেত্রেই কাব্যের ঘটনার মধ্যে সেই অভিজ্ঞতাকে প্রতিবিম্বিত করেছেন। কিন্তু একান্ত ব্যক্তিগত কোন অভিজ্ঞতা যথার্থ সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে না, যদি রচয়িতা নিজের সুখ-দুঃখকে বৃহত্তর পটভূমিতে স্থাপন করতে না পারেন। এদিক থেকে মুকুন্দ চক্রবর্তীর সমাজচেতনা গভীরভাবে বাস্তব ও তাৎপর্যপূর্ণ। তাই কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর সাহিত্য সৃষ্টিকে বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যের অগ্রদূতও বলা যায়।

কবিকঙ্কণ চক্রবর্তী রচনার অন্যতম উল্লেখযোগ্য অংশ হল 'পশুগণের গোহারি' বা ক্রন্দন অংশ। তৎকালীন সমাজ ছিল রাজা অথবা জমিদার নির্ভর। অর্থের প্রাধান্য হেতু এবং প্রতিপত্তির কারণে চাঁদ সদাগরের সমাজমান্যতা 'মনসামঙ্গল' কাব্যেও স্বীকৃত হয়েছে। চাঁদ বণিকের হাতের পুজোই মনসা দেবীকে সমাজে প্রতিষ্ঠা ও মাহাত্ম্য প্রচারে সহায়তা করবে এই ইঙ্গিত 'মনসামঙ্গলে'র শুরু থেকেই স্পষ্ট। কিন্তু 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে একদিকে যেমন ধনপতি সদাগরের প্রতিপত্তির, সামাজিক প্রতিষ্ঠার মান্যতা অন্যদিকে দরিদ্র, সমাজ অবহেলিত ব্যাধ কালকেতুর জীবনসংগ্রাম ও পারিপার্শ্বিক সমাজ। কালকেতু প্রধান 'আখেটিক খণ্ডে' পশুগণের ক্রন্দনের মাধ্যমে প্রজাদের দুর্গতি বর্ণিত হয়েছে। মুকুন্দ চক্রবর্তী 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ' অংশে লিখেছেন *"নাঞি মানে প্রজার গোহারি"* [২] আর 'পশুগণের গোহারি' অংশে লিখেছেন *"পশুর গোহারি শুনি সর্বমঙ্গলা"* [৩] অর্থাৎ রাজানুগ্রহের দায় কাব্য রচয়িতা স্বীকার করলেও সমাজসচেতনতাকে অস্বীকার করেননি। স্বাভাবিক রাষ্ট্রিক প্রভাবে প্রজার গোহারি যা রাজার কানে পৌঁছায়নি তাই কবিভাবনায় পৌঁছেছে সর্বমঙ্গলার কানে পশুগণের গোহারির রূপকে। দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন যে কাব্যের প্রধান সুর, সেই কাব্যধারায় দেবী স্বয়ংই আবির্ভূত হয়েছেন পশুকুলের দুঃখ নিবারণে। সমাজের দুরবস্থা বর্ণনায় কবি এই রূপকের মাধ্যমে যে সূক্ষ্ম সমাজচেতনার পরিচয় দিয়েছেন তা' কবিকঙ্কণকে তাঁর সমকালের থেকে অনেকটা এগিয়ে রেখেছে।

আর্যব্রাহ্মণদের কাছে বাংলার আর্যেতর অধিবাসীরা চিরকালই অত্যন্ত অবহেলিত। কিন্তু আর্য-অনার্যের মিলনের ফলে দু'ই সংস্কৃতির মিলন ঘটেছে। এই মিলন সংঘটিত হয়েছে সংঘাতের মধ্যে দিয়ে। এই সংঘাত ব্রাহ্মণ্য আদর্শের বিরুদ্ধে লৌকিক আদর্শের সংঘাত। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের আমরা দেখতে পাই কখনও আশীর্বাদক আবার কখনও শত্রুরূপে। যারা তার আশ্রয় গ্রহণ করেছে তাদেরকে দেবী প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী করেছেন। আর যারা তার বিরোধিতা করেছেন তারা হয়েছে হৃতগৌরব। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যেও দেবী চণ্ডিকা কালকেতুর ধনঘড়া নিজে বয়ে পৌঁছে দিয়ে এসেছেন তার বাড়িতে। সমাজ অবহেলিত ব্যাধ দেবীর কৃপায় রাজা হয়েছে আবার কলিঙ্গের রাজা বৈভব হারিয়ে ফকির হয়েছে।

সমাজের দুই ভিন্ন অর্থনৈতিক পরিসরকে প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপস্থাপনের দ্বারা স্পষ্টতর করেছেন কবি তাঁর কাব্যে। কাব্যরচনার মূলে যে পারিবারিক, সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অলিখিত কামনা কবি ব্যবহৃত আত্মপরিচয়মূলক ভণিতাগুলোতে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। একাধারে 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর 'আখেটিক খণ্ডে' সমাজের দরিদ্র নিরন্ন মানুষের দুর্গতি, যারা উদ্ভ্রান্ত পরিশ্রম করে দু'বেলা অন্নসংস্থানে ব্রতী। অন্যদিকে 'বণিক খণ্ডে' অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য সমাজের অবস্থানকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। তাই 'বণিক খণ্ডে' অভাব অনটন একেবারেই নেই বণিককুল সমাজে প্রতিষ্ঠিত, আর্থিক বৈভবে পরিপূর্ণ। এইক্ষেত্রে কবির অন্তর্দৃষ্টি সমাজের অন্যাংশে প্রবলতর হয়েছে, সতীন সমস্যা 'বণিক খণ্ডে' স্পষ্টতর।

প্রথমে মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'আখেটিক খণ্ডে' বর্ণিত সমাজের দিকটি প্রাসঙ্গিক ভাবে আলোচনার চেষ্টা করব। কালকেতু জাতিতে ব্যাধ, অস্পৃশ্য। ফুল্লরাকে নিয়ে কালকেতুর অনটন ক্লিষ্ট হতদরিদ্র সংসার। কিন্তু শিব চণ্ডিকার কলহ এখানে নেই। অনটনের দ্বারা যতই পীড়িত হোক কালকেতু ফুল্লরার মধ্যে বিরোধ নেই। মঙ্গলকাব্যধারায় কেন্দ্রিয় পুরুষ ও নারীর মধ্যে নারীটি প্রায়শই উদ্দিষ্ট দেব বা দেবীর ভক্ত হয়ে থাকে। ভক্ত নারী জোরালো ভূমিকাও গ্রহণ করে পুরুষটির মধ্যে ভক্তি উদ্রেকের। 'মনসামঙ্গল' কাব্যে যেমন সনকা চাঁদসদাগরকে মনসা পুজোর জন্য অনরোধ করেছে। অনুরূপভাবে 'চণ্ডীমঙ্গল' এর 'বণিক খণ্ডে' ধনপতি খুল্লনার প্রতি দৃষ্টি আরোপ করলেও একই চিত্র চোখে পড়ে। কিন্তু 'আখেটিক খণ্ডে' বিপরীত চিত্র আর্থসামাজিক প্রভাবে পুষ্ট। যেখানে দু'বেলা খাদ্যের অভাব সেখানে দু'জনের উদ্দেশ্যগত কোনো পার্থক্য ঘটে না। তাই ফুল্লরাও দেবার্চনা অপেক্ষা জীবনসংগ্রামে অধিক নিবিষ্ট।

মুকুন্দ চক্রবর্তী কালকেতু ফুল্লরার মধ্যে দেবদেবী সম্পর্কে ভাবনাগত সমতা এনে তাদের সংসারকে হয়তো আরও দৃঢ় বন্ধনে বেঁধেছেন। এই বন্ধন সামাজিক অবহেলার। ফুল্লরা তাই মঙ্গলকাব্য ধারায় স্বতন্ত্র নারী। সে রোজগার

করে আবার সিদ্ধান্ত নেবার সময় সম্পূর্ণরূপে কালকেতুর উপর নির্ভরশীল। কালকেতু দেবীর আচরণ সম্পর্কে সন্দেহ মুক্ত হবার পরে ফুল্লরাও নিঃসংশয়। লৌকিক জনজীবনের প্রতিভূ হবার জন্য অনার্য দেবীর আর্যীকরণের যে সমস্যা ছিল 'মনসামঙ্গল' বা 'চণ্ডীমঙ্গল' 'বণিকখণ্ডে' তা' 'চণ্ডীমঙ্গল' 'আখেটিক খণ্ডে' নেই। এক্ষেত্রে লড়াই স্বাচ্ছন্দ্য লাভের, দেবীর ও ভক্তর দু'জনেরই।

ফুল্লরার বারমাস্যা প্রসঙ্গে আশ্বিন মাসে অম্বিকা পূজার কথা আছে –

*"আশ্বিনে অম্বিকা – পূজা প্রতি ঘরে ঘরে"* [৪]

অর্থাৎ সমাজে অম্বিকা পূজার প্রচলন ছিল। দেবীপূজা নিয়ে সমাজে কোনো মতবিরোধ ছিল না। বরং অম্বিকা পূজার দিনগুলোতে সব রমণীই শুদ্ধ কাপড় পড়ে। এই সাধপূরণের ইচ্ছা ফুল্লরার মধ্যেও ছিল –

*"উত্তমবসন বেশ করয়ে বণিতা*
*অভাগি ফুল্লরা করে সম্বলের চিন্তা।"* [৫]

ফুল্লরার সাধপূরণ সম্ভব হয় না সাংসারিক অভাবের তাড়নায়।

'আখেটিক খণ্ডে' কালকেতু ফুল্লরার সংসার অন্ত্যজ অনার্য লৌকিকজীবনের সংসার। সেই সংসার চলে ফুল্লরার হাটে বিক্রি করা পশুমাংসের বিনিময়ে। ব্যাধ স্বামী পশু শিকার করে আর ব্যাধ বণিতা যায় 'বেসাতি' করতে।

*"সিঙ্গার পসরা করে ফুল্লরা বাজারে*
*পণমুলে সিঙ্গা জোড় বেচে সিঙ্গাদারে।"* [৬]

অন্ত্যজ শ্রেণির দারিদ্র্যের সংসারে নারীপুরুষ উভয়েই সমান অধিকারে প্রতিষ্ঠিত। যে সংসারের সূচনা প্রকৃতপক্ষে ধর্মকেতু ও নিদয়ার বারাণসী যাত্রার পর থেকে।

*"ছায়া সঙ্গে ধর্মকেতু ভাবিলেন মুক্তিহেতু*
*বারাণসী করিল পয়ান।*
*দাম্পত্যে লোটায়্যা কান্দে কেশপাশ নাহি বান্ধে*
*মাসে মাসে পাঠান সম্বল।"* [৭]

এই ঘটনায় শ্বশুর শাশুড়ির জন্য পুত্রবধূর ক্রন্দন কবির বর্ণনায় মাধুর্যমণ্ডিত। তৎকালীন শাশুড়ি ও ননদের সঙ্গে পুত্রবধূর প্রতিকূল সম্পর্কের চিত্র মধ্যযুগীয় কাব্যে থাকলেও উক্ত কাব্যে প্রচলিত চিত্র পরিবর্তন ব্যাধের দারিদ্র্যের সংসারে সুদৃঢ় মানসিক বন্ধনকে পরিস্ফুট করে।

কালকেতু ফুল্লরার জীবনযাপনে দারিদ্র্য নিত্যসঙ্গি হলেও মৃগয়ায় পশু বধ করতে পারলে অভাব ততটা চোখে পড়ে না। স্বামী স্ত্রীর যৌথ প্রচেষ্টায় সংসার যাত্রা চলে সহজ গতিতে। ফুল্লরা হাটে মাংস বিক্রি করে আবার সংসারও সামলায় নিপুণ দক্ষতায়।

*"ফুল্লরা বীরের তরে কর‍্যাছে রন্ধন"* [৮]

ফুল্লরার সামাজিক স্থিতিই তাকে বাধ্য করেছে অন্দর ও বাইরে দুই দিক রক্ষার জন্য। এটাই তার সামাজিক – স্বাভাবিক জীবন। এতেই সে অভ্যস্ত। সে আনন্দে গর্বে তৃপ্ত। শারীরিক শ্রম তার আনন্দে বিঘ্ন ঘটাতে পারে না। স্বামীসেবার আনন্দে ফুল্লরা ক্ষণিকের জন্য তার দারিদ্র্য অনটন ভুলতে পারে।

*"পাখালিল মহাবীর পদ পাণি মুখ*
*ভোজন করিতে বৈসে মনের কৌতুক।"* [৯]

খাদ্যতালিকা বর্ণনায় অভাবের স্পষ্ট চিহ্ন কিন্তু তার মধ্যে আক্ষেপ নেই রয়েছে ভোজনে তৃপ্ত হবার মাধুর্য। কালকেতুর এই তৃপ্তি ব্যাধ বণিতা ফুল্লরাকে তৃপ্ত করে। সে বাঙালি গৃহিণীর ন্যায় লজ্জার সঙ্গে আসন পাতে, ভোজনের জায়গা ঠিক করে, যত্ন করে খাবার পরিবেশন করে। তার যত্নে ঢাকা পড়ে অভাবের চিহ্ন।

*"সম্ভ্রমে ফুল্লরা পাতে মাটিআ পাথরা*
*বেঞ্জনের তরে দিল নৌতুন খাপরা।"* [১০]

যে ফুল্লরা হাটে পুরোদস্তুর ব্যবসায়ী, ঘরে সে সলজ্জ বধূ। তার সামাজিক অবস্থান তার চরিত্রের এই দু'ইদিককে ভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছে। কালকেতুর ভোজনের দৃশ্যে হাস্যকর ইঙ্গিত থাকলেও প্রাধান্য পেয়েছে বৈভবহীন গৃহস্থালির বাস্তব সমাজসম্মত রূপ –

*"বুড়ি দুই তিন খায় আলু ওল পোড়া*
*সারি কচু ঘন্টে মিশা করঞ্জা আমড়া।"* [১১]

আলু ওল পোড়া সম্বলিত কচু ঘন্ট খেয়ে ক্লান্ত কালকেতুর সামনে ফুল্লরাকে কবি নীরব দ্রষ্টা রূপে দাঁড় করিয়েছেন। এই নীরবতাই মুখরা ফুল্লরার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসহায়তাকে বেশি বাঙ্ময় করে তুলেছে।

মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গলে'র আখেটিক খণ্ডের 'কালকেতুর খেদ' অংশ থেকে ব্যাধের সংসারের অভাবের স্থায়িত্ব ও সত্যতা ক্রমে প্রকাশিত হতে থেকেছে। কালকেতু দিন আনে দিন খায়– এভাবেই সে সংসার যাত্রা নির্বাহ করে। তাদের সম্বল বলতে কিছুই নেই। শিকার না মিললে ঋণ করতে হয় –

*"ফুল্লরা দু'কাঠা চালু মাগিল উধার*
*কালি দিহ বল্যা সই কৈল অঙ্গিকার।"* [১২]

তাই দেবীর ছলনায় কালকেতু শিকার না পেয়ে চিন্তিত –

*"পথে জাইতে মহাবীর খায় বনফল*
*মলিনবদনে চিন্তে ঘরের সম্বল।"* [১৩]

আর কাতর হয় ফুল্লরার কথা ভেবে –

*"দুঃখিনী ফুল্লরা মোর আছে প্রতিয়াসে*
*কি বলিব গিআ আমি ফুল্লরার পাশে।"* [১৪]

কালকেতু অভাবের সংসারে চিন্তায় আকুল। ফুল্লরার অসহায়তার কথা স্মরণে আরও ব্যথিত। সাংসারিক এই দারিদ্র্যই কালকেতু ফুল্লরার সংসারের প্রকৃত সত্য, তাদের আস্থার ভিত্তি।

কবিকঙ্কণের কাব্যে দেবখণ্ডেও দারিদ্র্য পীড়িত স্বামী-স্ত্রী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন শিব ও চণ্ডিকা। এই দারিদ্র্যে অভিযোগ থাকলেও চিন্তার গভীরতা ও প্রবণতা চোখে পড়ে না। কালকেতুর ক্ষেত্রে গভীর চিন্তাপ্রাবল্য বোঝা যায় এই পঙক্তি উল্লেখে –

*"বিষম উদরের জ্বালা মহাবীরে লাগে*
*এক চক্ষে নিদ্রা যায় আর চক্ষে জাগে।"* [১৫]

এই বাস্তব অভিজ্ঞতা কালকেতুর কাছে নরকভোগের সমান –

*"এথাই নরক স্বর্গ সুনি ভাগবতে*
*নরক ভুঞ্জিতে কালু আইল মরতে।"* [১৬]

সংসার নিয়ে এই দুঃখ একা কালকেতুর নয় তা' ফুল্লরারও। 'ফুল্লরার খেদ' অংশে এর পরিচয় আছে। সাংসারিক অনটন নিয়ে ফুল্লরার চিন্তা আবেগ আরো মর্মস্পর্শী ও বেদনা জর্জরিত। তাই কালকেতুকে শূন্য হাতে ফিরতে দেখে ফুল্লরা –

*"বীরে দেখি শূন্যপাণি কপালে আঘাত হানি*
*করে রামা দেব স্মঙরন"* [১৭]

কিন্তু ভাগ্যকে দোষারোপ করে অভাবজনিত দুশ্চিন্তা ব্যক্ত করার চেয়েও ফুল্লরা ভবিষ্যতচিন্তায় আরও আকুল হয়েছে। যে চিন্তা নিজের জন্য নয়, কালকেতুর জন্য – স্বামীর জন্য নারী মনের ভাবনা। সে ভাবনায় অভিযোগের ইঙ্গিত কারুণ্যে পর্যবসিত হয়েছে –

*"কপালে আঘাত হানি কান্দে ব্যাধনন্দিনী*
*নিশ্বাসে মলিন মুখচাঁন্দে*
*দারুণ দৈবের গতি সকলে দরিদ্র পতি*
*পড়িনু সম্বলচিন্তা ফাঁদে"* [১৮]

ভেরেণ্ডার থামযুক্ত পাতার ছাউনি দেওয়া ব্যাধ দম্পতির ভাঙা কুঁড়ে ঘরই কালকেতু ফুল্লরার অন্তিম সম্বল। যে ঘরের সর্বত্র অনাহার, অভাব, দারিদ্র্যের স্পষ্ট প্রকাশ। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা যাবতীয় দুঃখ কষ্ট সহ্য করে মাংসের পসরা নিয়ে বেরতে হয় ফুল্লরাকে।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর প্রতিভার চরম উৎকর্ষ দেখা যায় দুঃখ বর্ণনায়। তিনি নিজের কাব্য রচনা পূর্ববর্তী জীবনের আত্মকাহিনি বর্ণনা, ফুল্লরার বারমাস্যা বর্ণনা, কালকেতুর তাড়নায় পীড়িত পশুদের বিলাপ বর্ণনায় যে দক্ষতার পরিচয় দেন তা' অনবদ্য। বিশেষভাবে উল্লেখ্য ফুল্লরার বারমাস্যা সম্বন্ধে কবির নিপুণ বর্ণনা। ফুল্লরা চণ্ডীকে তার সতীন ভেবে দুঃখকে অতিরঞ্জিত করেছে। তাই এই বারমাস্যা দুঃখের হয়েও, অতিকথন হয়েছে কিন্তু অবাস্তব হয়ে ওঠেনি ফুল্লরার উদ্দেশ্যমূলকতার কারণে। সমালোচক সনৎকুমার নস্করের মতে

*"কবি কি নিপুণতায় তুলে ধরেন ফুল্লরার নারীমনের ভাবনা ও চাতুর্য।"* [১৯]

কবিকঙ্কণ ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতা, দারিদ্র্যর রেখাচিত্র অংকনের পরেই নিদয়ার সাধভক্ষণ অংশ থেকে যে বাস্তবসম্মত, সমাজ অবহেলিত ব্যাধ পরিবারের দৈন্যতার চিত্রাংকন শুরু করেছিলেন তা' ভিন্নতর মাত্রায় উন্নীত হয়েছে ফুল্লরার বারমাস্যা অংশে।

নিদয়ার সাধভক্ষণ অংশে তার সাধ অপূর্ণই থেকেছে। রীতি অনুযায়ী গর্ভবতী নারীর ইচ্ছা বা সাধ অনুযায়ী খাদ্যরন্ধনের আয়োজন করা হয়। ব্যাধবধূ নিদয়ার ক্ষেত্রের এই আয়োজন হয়েছে। সেই অনুষ্ঠানে ব্যাধ পরিবারের সাধ্যানুযায়ী যে সব খাদ্যদ্রব্যর তালিকা কবি উল্লেখ করেছেন তা' অত্যন্ত বাস্তবসম্মত। সাধ্য এখানে নিদয়ার সব সাধ পূর্ণ হতে দেয়নি। এই বাস্তব সমাজ চিত্র কবির কলমে বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে আর সমগ্র কাব্যে দুই বিপরীত সামাজিক অবস্থানের বিন্যাসকে গাঢ়তর করেছে। যখন নিদয়া বলে –

*"লোন কিছু দিবে বাড়া নেউল গোধিকা পোড়া*
*হাঁসাডিম্বে কিছু তোল বড়া*
*কীছু ভাজ বালিকড়া চিঙ্গড়ির তোলবড়া*
*সসারু করহ শিকপোড়া।"* [২০]

এ তো হল নিদয়ার ইচ্ছা, সে আরও খেতে চেয়েছে –

*"নিধানী করিয়া খই তথি মহিষের দই*
*কুলি করঞ্জা প্রাণ হেন বাসি*
*যদি পাই মিঠা ঘোল পাকা চালিতার ঝোল*
*প্রাণ পাই পাইলে আঁমসি।"* [২১]

মহিষের দধিতে 'ভিজানো' ধানশূন্য খই (নিধানী), কুল, করঞ্জার মত টক ফল, পাকা চালতার ঝোল, মিঠে ঘোল আবার পলতার শাক, রান্নায় চাই মরিচের ঝাল, হলুদ বর্ণের পাকা তাল। এই খাদ্যতালিকা যেমন নিদয়ার ইচ্ছের প্রতিফলন তেমনই ব্যাধজীবনের খাদ্যাভাসের পরিচায়ক। তার সঙ্গে এই চাওয়া পূর্ণ না হবার মধ্যে অবহেলিত দারিদ্র্য পীড়িত ব্যাধসমাজের হতশ্রীর চিত্র।

নিদয়ার সাধের খাদ্যতালিকায় মুকুন্দ চক্রবর্তী ব্যাধ জীবন ও সাধারণ বাঙালির খাদ্যরুচিকে মিশিয়ে দিয়েছেন। ফলে এই খাদ্যতালিকা ব্যাধ পরিবারের হলেও এককভাবে ব্যাধজীবনের হয়ে থাকেনি, সকলের হয়ে উঠেছে। কিন্তু মুকুন্দ চক্রবর্তী কেবল বাস্তবের হুবহু ও নিষ্প্রাণ রূপকার নন, তিনি বাস্তবরসের স্রষ্টা। নিদয়ার সাধভক্ষণে নিদয়া ধর্মকেতুকে বলেছে –

*"নিকটে নাহিক মাতা কারে কব দুঃখ কথা*
*পিসি মাসি বহিনী মাতুলি*
*জ্ঞাতি বন্ধু নাহি আর যে সহে ঘরের ভার*
*বিধি মোরে করিল প্রতিকুলী।"* [২২]

এই আক্ষেপ উক্তির মধ্যে সাধভক্ষণের প্রথাকে সামনে রেখে গার্হস্থ্য জীবনের সুখ-দুঃখ প্রতিবিম্ব রচনার অনায়াস অবকাশ কবিকঙ্কণ সৃষ্টি করে নিয়েছেন। এখানে দুঃখই সত্য, কিন্তু আরো সত্য স্বজন-পরিজনে ভরপুর গৃহের জন্য

পরোক্ষ বাসনা। ভরা গৃহে সন্তানসম্ভবা নিদয়া নিজের দুঃখের ভার অন্য কাউকে অর্পণ করতে পারত, নারী হয়ে নারীর কাছে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ভালোলাগা-মন্দলাগাকে সহজে প্রকাশ করতে পারত, কায়িক ক্লেশও লাঘব করতে পারত। কিন্তু সে উপায় নেই। সে জ্ঞাতি বন্ধুর থেকে দূরে। মা, মাসী, পিসি কারোর সান্নিধ্য না পেয়ে স্বামী ধর্মকেতুর কাছে তার বেদনা, চাওয়া, না পাওয়া সব ব্যক্ত করেছে নিদয়া। অভাবের গৃহে আত্মীয়হীনতা ব্যাধ দম্পতির দাম্পত্য বন্ধনকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করেছে। পুরুষ হয়েও তাই ধর্মকেতু রান্নার আয়োজন করে। এই চিত্র বৈভবী বণিকগৃহে অসম্ভব।

সংসারে পুরুষের এক অন্যতর ভূমিকা এই সূত্রে নির্দেশ করেছেন কবিকঙ্কণ চক্রবর্তী। যার সঙ্গে কিন্তু দেবখণ্ডের শিবের ছবি মেলে না। ধর্মকেতুর গৃহনিপুণতার পরিচয় বৈভবী বণিক কুল অথবা অভাবী দেবখণ্ডের থেকে পৃথক। যার পরিচয় মেলে এই ছত্রে –

*"নিদয়ার সাধ হেতু ঘরে জায় ধর্মকেতু*
*চাহিয়া আনিল আয়োজন*
*আপনি রাঁধিয়া ব্যাধ নিদয়ারে দিল সাধ*
*বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ।"* [২৩]

কালকেতুকে ফুল্লরার রান্না করে খাওয়ানোর চিত্রও আছে এই 'আখেটিক খণ্ডে'। মুকুন্দ গার্হস্থ্য জীবনের সার্থক রূপকার। ধর্মকেতুকে তিনি গার্হস্থ্য জীবন রসে মগ্ন করে তুলেছেন। ধর্মকেতু নিদয়ার সংসারে ধর্মকেতুর ব্যাধবৃত্তি ও রান্নার আয়োজন। আবার কালকেতু ফুল্লরার সংসারে ফুল্লরা একাই ঘর-বাইরে দু'ই সামলেছে। আর্থসামাজিক অবস্থান যে নারীপুরুষের প্রচলিত কর্মপরিধিরও পরিবর্তনের সূচক তা' মুকুন্দ চক্রবর্তী স্পষ্ট করেছেন।

এই একই কাব্যর অপর অংশ 'বণিক খণ্ড'র চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। কালকেতু ফুল্লরার যে দুঃখ পীড়িত, অভাব ক্লিষ্ট সংসারের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, 'বণিক খণ্ডে' ধনপতি লহনা ও খুল্লনার কাহিনিতে কোনো অভাব, তাড়নার ছায়াপাত ঘটে না। সমাজের দু'ই স্তরকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন কবিকঙ্কণ।

বাস্তবধর্মী কাহিনির বিন্যাস কৌশল এবং স্বাভাবিক চরিত্র সৃষ্টিতে কবিকঙ্কণ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এমন বিস্ময়কর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন যে দেশী, বিদেশী উভয় সমালোচকই কবির বাস্তবধর্মিতা, সমাজ ও চরিত্র চিত্রাংকনের প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছেন।

উজানীরাজ বিক্রমকেশরী পরম শৈব, তিনি দেবী দুর্গার বিশেষ অনুগ্রহভাজন–

*"উজানি নগর অতি মনোহর*
*বিক্রমকেশরী রাজা*
*শোল উপচারে নিত্যে পূজা করে*
*কৃপা কৈল দশভুজা।"* [২৪]

দানকর্মে তিনি কর্ণ, তিনি প্রজাবৎসল, সত্য ও জ্ঞানের সাধক তিনি। বিশাল তাঁর রাজধানী, বিপুল তাঁর ঐশ্বর্য, শৌর্য বীর্যে তিনি মহাপ্রতাপশালী। রাজা সংগীত, শাস্ত্র ও দ্বিজে ভক্তিমান।

*"জেন রঘু রাজা হেন পালে প্রজা*
*কর্ণের সমান দাতা*
*যুধিষ্ঠির বাণী শুকদেব জ্ঞানী*
*প্রসন্ন মঙ্গলা মাতা।"* [২৫]

সৎগুণসম্পন্ন এই রাজার রাজ্যের ললনাগণও যেন রূপে স্বর্গ অপ্সরীসম। বিক্রমকেশরীর রাজ্যে সদাগরের সংখ্যাও প্রচুর। ধনপতি তাদের অন্যতম। তিনি রাজার প্রিয়পাত্র।

'বণিক খণ্ডে' বর্ণিত ধনপতি চরিত্র পরিকল্পনায় কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর সমাজসচেতন দৃষ্টি বিশেষ কার্যকরী হয়েছে। 'বণিক খণ্ডে'র নায়ক ধনপতি তৎকালীন সমাজের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। তাই নিম্নবর্গের মধ্যে পূজা প্রচারের পর দেবী চণ্ডিকা উচ্চবর্ণের সমাজে পূজাপ্রচারের উদ্দেশ্যে সচেষ্ট। দেবীর এই উদ্দেশ্যপূরণের কাহিনিই বণিক খণ্ডে বর্ণিত। এই সমাজ ও সমাজের সংকট ভিন্ন, তাই কাহিনিও ভিন্ন বিন্যাসে বিস্তারিত।

নাগরিক আচার আচরণে ত্রুটিহীন জীবনচর্চায় ধনসম্পদের প্রাচুর্য। ধনপতি কখনও ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে গৃহের কথা ভুলে যাচ্ছেন। ভোগবিলাসের অন্যতম নমুনা হিসেবে কবিকঙ্কণ 'পায়রা ওড়ানো' বা 'পায়রার সঙ্গে খেলা'র এক দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন। চতুর্থ দিবসের 'নিশা' অংশে 'বণিক খণ্ডে'র শুরু –

*"পায়রা উড়াতে জায় সাধু ধনপতি*
*জত নগরিআ শিশু লইআ সংহতি।"* [২৬]

অর্থাৎ তৎকালীন বণিক সমাজের অন্যতম বিনোদনের অংশ ছিল পায়রা ওড়ানো। সমাজে উচ্চবিত্তীয়দের নানাবিধ ক্রীড়া ছাড়াও ছিল আমোদের আরও নানা আয়োজন। জীবনের রসাস্বাদনে খেলা বা 'ক্রীড়া' সংস্কৃতির একটি অংশ। মধ্যযুগের ক্ষেত্রেও বিষয়টি সমভাবে প্রযোজ্য। সমাজের উচ্চতর থেকে নিম্নতর সর্বত্রই অবকাশ যাপনের অন্যতম অংশ 'ক্রীড়া' ময়তা। উচ্চবৃত্তর সমাজে ছিল পাশাখেলা, পায়রা ওড়ানো আর নিম্নবৃত্তীয় মানুষের কাছে পাথরের ঢেলা নিয়ে খেলাই তার বিনোদন।

'আখেটিক খণ্ডে' বাল্যক্রীড়ার বর্ণনা রয়েছে কালকেতুকে ঘিরে। কালকেতু ঢেলা নিয়ে খেলা করে। কখনও সে সঙ্গহীন হয়ে পড়ে সাথীদের জীবনসংশয় ঘটানোর অবুঝ পদক্ষেপে। যে খেলুড়ে তাকে আঁকড়ে ধরে সবল কালকেতু তাকে ধরেই আছাড় মারে। শিশুদের সঙ্গে কালকেতু শজারুকে তাড়া করে ধরে ফেলে, 'বাটুল' দিয়ে পাখি মেরে লতায় পাতায় জড়িয়ে কাঁধে ফেলে কালকেতু বীরের তৃপ্তিতে বাড়ি ফেরে। এ খেলার বিস্তার সবটুকুই লৌকিক এবং ব্যাধজীবনের বাস্তবতার স্পষ্টরূপ।

*"ইচ্ছা জায় জেই দিনে বন জায় বাপ সনে*
*আগে ধান জিনিঞা পবনে*
*তাড়িয়া হরিণ ধরে কি কাজ ধনুক শরে*
*বিভা হেতু ব্যাধ চিন্তে মনে।"* [২৭]

পাশাপাশি 'বণিক খণ্ডে'ও কবিকঙ্কণ বাল্যক্রীড়ার কথা তুলেছেন বৈভবে, বিলাসে, শখের অবকাশ যাপনে –

*"রাজার আদেশে ধনপতি বৈসে*
*জারে সুখী নৃপবর।*
*লয়্যা শিশুগুণ বণিকনন্দন*
*পায়রা উড়াতে জায়।"* [২৮]

এখানে লোকক্রীড়ার চিত্র। কিন্তু দুই খণ্ডে লোকক্রীড়া আর্থসামাজিক কারণে ভিন্ন ও পৃথক পরিসরে বিন্যস্ত।

কালকেতু ফুল্লরার বিবাহ অংশে কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী সেইভাবে কোনো উদ্‌যাপন বর্ণনা করেননি। সামান্য কয়েকটি পঙক্তিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন বিবাহ প্রস্তাব-

*"ভক্ষ দ্রব্য করি জড় বান্ধবের মেলা*
*সজ্জম আনিঞা বরে দিল বরমালা।"* [২৯]

'বণিক খণ্ডে' ধনপতি খুল্লনার বিবাহ অংশের বর্ণনা দীর্ঘ। এই বর্ণনা পার্থক্যে সামাজিক অবস্থানের পার্থক্যও পরিষ্কার-

*"জুয়া খেলা কৈল সাধু খুল্লনার সনে*
*খুল্লনার জয় দেখি হাসে রামাগণে।"* [৩০]

জুয়া খেলার মাধ্যমে তৎকালীন উচ্চবিত্তীয় সমাজের বিলাসী দিকের প্রকাশ। আবার খুল্লনার রূপেগুণে মুগ্ধ ধনপতি ওঝাকে দিয়ে খুল্লনার সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব পাঠায়। বিবাহের শুভদিন শুভলগ্নে যথাবিধি আড়ম্বরে বিবাহ হয় খুল্লনা ও ধনপতির–

*"মৃদঙ্গ পটহ বাজে বেণি জোড়া শঙ্খ*
*টমক খমক সানি বাজে জগঝম্প।"* [৩১]

চন্দন, কুসুম, গুয়াপান, পঞ্চরত্ন, যৌতুক, ভেট, কৌতুক – এই শব্দগুলো 'বণিক খণ্ডে' বহুল ব্যবহৃত। যা হয়ে উঠেছে প্রাচুর্যের ইঙ্গিতবাহী। 'আখেটিক খণ্ড' প্রাচুর্যহীন। তাই এই শব্দগুলোর ব্যবহার নেই পূর্বোক্ত খণ্ডে।

মুকুন্দ চক্রবর্তী 'দেবখণ্ডে' অন্নহীন শিবের ভোজনেচ্ছার কথা বলেছিলেন, দিয়েছিলেন ভোজন উপকরণের দীর্ঘ তালিকাও। সেই উপকরণ সংগ্রহের সামর্থ শিবের ছিল না। 'আখেটিক খণ্ডে' কালকেতু শিকার করে যা পেয়েছে, তাই দিয়েই ভোজন সাঙ্গ করেছে। কচু দিয়ে করঞ্জা, আমড়ার টক খাবার পরে জানতে চেয়েছে আর কিছু আছে কিনা। ফুল্লরার রন্ধনের অল্প উপকরণেই কালকেতুকে তৃপ্ত হতে হয়েছে। 'বণিক খণ্ডে' ধনপতির প্রত্যাবর্তন অংশে খুল্লনার ইচ্ছা –

*"জদি আসেবন নাথ পঞ্চাশ বেঞ্জন ভাত*
*হেম থালে করাব ভোজন*
*সুবর্ণপঞ্জরে বসে পুরিব তোমার আশ*
*দাসী হইয়া করিব সেবন।"* [৩২]

অর্থাৎ অভাবহীন আয়োজনের ব্যবস্থা।

ধনপতির প্রত্যাবর্তনকালে খুল্লনার রন্ধনের যে দীর্ঘতালিকা তার মধ্যে সামাজিক বৈভব ও আর্থসামাজিক পারিপাট্যের প্রকাশ –

*"মুসুর মিশ্রিত মাষ রান্ধে দিআ রসবাস*
*হিঙ্গ জীরা বাসে সুবাসিত*
*ভাজ্যা চিতলের কোল কাতলা মাছের ঝোল*
*মান বড়ি মরীচ ভূষিত।"* [৩৩]

ভোজনেচ্ছা ও ভোজন পরিবেশনেও দুই সমাজ ভিন্ন।

বাণিজ্যের বর্ণনা 'বণিক খণ্ডে' বিস্তৃতভাবে স্থান পেয়েছে। ধনপতি সিংহল রাজের দরবারে উপস্থির হয়ে বলে – তুরঙ্গ, নারকেল, বিড়ঙ্গ, পায়রা, বহড়া, হরিতাল, শুণ্ঠ, গাছফল, প্লবঙ্গ, সিন্দু, লবণশুলফা, শুক্তা, গুজ্ঞা, পাটশন, পাট, কাষ্ঠ, আকন্দ, লবণ, ভেড়া, শকট প্রভৃতি দ্রব্যের পরিবর্তে যথাক্রমে কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, শঙ্খ, জায়ফল, গুয়া, হিঙ্গুল, লবঙ্গ, টঙ্ক, শুয়া, পলা, শ্বেত, চামল, নীলা, সৈন্ধব, জিয়া, মাকন্দ, হীরা, চন্দন, তাড়া, মুক্তা, ঘোড়া, তৈল প্রভৃতি দ্রব্য তার চাই।

'বণিক খণ্ডে' বর্ণিত সুশীলার বারোমাস্যা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর। এই অংশে সুশীলার মনের অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটেছে ঋতুর ক্রমান্বয়ে। মনোবেদনার সঙ্গে সঙ্গে বণিক সম্প্রদায়ে ব্যবহৃত সামগ্রীর দীর্ঘ বর্ণনা আছে। বৈশাখ মাসের বর্ণনায় কবি বলেছেন –

*"চন্দনাদি তৈল অঙ্গে সুশীতল ধারি*
*সীঙলি গামছা দিব ভূষিত কস্তরি।"* [৩৪]

এছাড়া শীতলচন্দন, শ্বেতচামর, মধু, মৎস্য, মাংস – নানা উপহারের উল্লেখ আছে। 'আখেটিক খণ্ডে' কালকেতু ফুল্লরা দাম্পত্যে, অভাবের চিন্তার প্রতিফলন 'ফুল্লরার বারোমাস্যা'য়। বৈশাখ মাসে মাংস বিক্রি হয় না সবাই 'নিরামিষ' খাদ্য গ্রহণ করায়। এরপর ক্রমান্বয়ে প্রতি ঋতুতে তার দুর্গতির বর্ণনা। মাংস বাসী হয়ে গেলে বিক্রি হয় না। সারাবছরই দারিদ্র্য। 'বণিক খণ্ডে'র সুশীলার বারোমাস্যা কিন্তু মানসিক যন্ত্রণার ছবি। আর্থসামাজিক অনটন তাকে পীড়িত করেনি। 'বণিক খণ্ডে' শ্রীপতির দ্বিতীয় বিবাহ বিত্তশালী পরিবারের বিবাহের চিহ্নবহনকারী –

*"দম্পত্য প্রবেশি ঘরে খির খণ্ড ভোগ করে*
*রাত্রি গেল কুসুমশয্যায়"* [৩৫]

ধনী দম্পতির পুষ্পশয্যার, প্রাচুর্যের বর্ণনা মূলত সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য, প্রতিষ্ঠার পরিচায়ক।

কালকেতু ফুল্লরার দুঃখ দারিদ্র্যর চিত্র বর্ণনা করার পর যখন কালকেতু দেবীর আশীর্বাদধন্য হয়ে প্রচুর অর্থের মালিক হয়, তখন কবি অসাধারণ শিল্প দক্ষতায় আর্থিক বৈষম্যকে সমাজে স্থাপন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন জাতপাতের বিভেদ বৈষম্য অনেকাংশে আর্থিক বৈষম্যের উপর নির্ভরশীল ও নির্ণীয়মান। সামাজিক প্রবণতা অনুসারে নিম্নবিত্তীয় মানুষকে সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। তার উপর আরোপিত হয় অস্পৃশ্যতার অভিশাপ। এই অস্পৃশ্যরাই যখন ধনলাভের অধিকারী হয় তখন সমাজ তাদেরকেই গ্রহণ করে।

সামাজিক অবস্থান ব্যতিরেকে কালকেতু ও ফুল্লরার মধ্যে অর্থপ্রাপ্তির প্রভাব পড়েনি। ফুল্লরা ব্যাধরমণীর বুদ্ধিমত্তার সীমাবদ্ধতায় ধারের চেয়ে ভারের মূল্যকে বেশি ভেবেছে। দরিদ্র কালকেতু 'চিয়াড়' বা তীক্ষ্ণধার বাঁশছাল দিয়ে ডালিম গাছের তলা খুঁড়ে ধনলাভ করেছে। কালকেতু এক-একবারে দু'ঘড়া করে বয়ে এনেছে। ব্যাধজীবনের তথা নিমবর্গের নিম্নবিত্তীয় নায়ক কালকেতু অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার মানসিকতা রাখে না। সে আত্মনির্ভর হতে শিখেছে তার আর্থসামাজিক অবস্থার দায়ে। তাই সর্বতভাবে সে আতিশয্যহীন, পরিশ্রমী ব্যাধ।

বণিক সম্প্রদায়ের বিপুল ঐশ্বর্য, তাদের আতিশয্যে লালিত করেছে তাই তাদের স্বনির্ভরতার মাপকাঠি মূলত আর্থিক।

ষোড়শ শতকের বাংলাদেশের সমাজ ও গার্হস্থ্য জীবনের এক যথার্থ রূপকার হিসাবে মুকুন্দ চক্রবর্তী অগ্রগণ্য। তৎকালীন সমাজ দুঃখ, দৈন্য, গৌরব ও অগৌরব– সবই কবি আন্তরিকভাবে পর্যবেক্ষণ ও অংকন করেছেন।

সমগ্র মধ্যযুগে পৌরাণিকতা ও আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে মিশ্রিতভাবে বাংলার লৌকিক জীবন বা জনসমাজকে দেখা যায়। কবি কখনও সচেতনভাবে সমাজভাবনায় উদ্বুদ্ধ আবার কখনও অভিজ্ঞতার দ্বারা আহৃত সমাজ চিত্রগুলো অংকনে দক্ষ। মধুযুগীয় কবির মধ্যেও ছিল সমাজবোধ। কিন্তু তার প্রকাশ বা অভিব্যক্তি ছিল ভিন্ন। বর্তমান যুগে মানুষ সামাজিক জীব হয়েও আপন ব্যক্তিসত্তা সম্বন্ধে সচেতন। কিন্তু অতীত কালে মানুষ আপন ব্যক্তিসত্তা অপেক্ষা সমাজকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছে। সমাজের বাইরে নিজের পৃথক অস্তিত্বকে মান্যতা দিতে পারেনি। তবে সচেতনভাবে না হলেও কবিমন সর্বদাই পৃথক, তার অনুভব ভিন্ন। ব্যাধজীবন ও বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ কবির গভীর অনুপ্রবেশ এবং তার সঙ্গে হার্দিক ঐক্যানুভব তাঁর বর্ণনাকে বাস্তব সত্য করে তুলেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে অনস্বীকার্য দারিদ্র্যের মধ্যে তিনি সৌন্দর্য স্রষ্টা, বৈভব বর্ণনায় তিনি সংযমী। এই আশ্চর্য পরিমিতি বোধই কবিকঙ্কণ চক্রবর্তীকে দুই বিপরীত সমাজপ্রেক্ষিতকে সার্থক রূপায়নে যথার্থ সহায়তা করেছে।

শাপভ্রষ্ট দেবসমাজের মর্ত্যলীলার ক্ষেত্রে দু'ই কাহিনির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তবে প্রথম কাহিনিতে কবি অভিশপ্ত দেবকুমারকে অনায়াসে দরিদ্র ব্যাধের রূপ দিয়েছেন। তাকে অবলম্বন করে সমসাময়িক প্রজার দুঃখ উঠে এসেছে রূপকের মাধ্যমে। এই ব্যাধ আবার পরবর্তীতে রাজা, কিন্তু সেই রাজার রাজত্ব কাব্যরচনাকালে কবি সে স্বাচ্ছন্দ্যটুকু পেয়েছিলেন তার প্রতিফলন, সে রাজা প্রজাবৎসল।

'বণিক খণ্ড' কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ছায়াপাত নগণ্য। এখানে কবিকল্পনা মূল অবলম্বন। এই অংশের প্রাচুর্য বর্ণনাতেও কবি সাবলীল। দু'ই খণ্ডে সম্পূর্ণ দু'ই বিপরীত সমাজকে কবি উপস্থাপন করেছেন সার্থকভাবে। প্রথমটি তার জীবন অভিজ্ঞতালব্ধ, দ্বিতীয়টি মঙ্গলকাব্য ধারায় অনুসরণ। এই দুই বিপরীত সমাজ, বৈষম্যকে নিপুণ কবি তার সহজাত পরিমিতিবোধের দ্বারা সার্থক সামঞ্জস্য গেঁথেছেন। তাই বৈপরীত্যর সমতায় দুই বিপরীত সমাজের পরিচায়ক হিসাবে 'চণ্ডীমঙ্গল' মধ্যযুগীয় কাব্যধারায় এক সার্থক সৃষ্টি।

**তথ্যসূত্র :**

১। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী, 'চণ্ডীমঙ্গল', সুকুমার সেন সম্পাদিত, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ২০০১, পৃঃ-৩
২। পূর্বোক্ত, পৃঃ-৩
৩। পূর্বোক্ত, পৃঃ-৫১
৪। পূর্বোক্ত, পৃঃ-৬১
৫। পূর্বোক্ত, পৃঃ-৬১
৬। পূর্বোক্ত, পৃঃ-৪৫
৭। পূর্বোক্ত, পৃঃ-৪৪
৮। পূর্বোক্ত, পৃঃ-৪৫

৯। পূর্বোক্ত, পৃঃ-৪৫
১০। পূর্বোক্ত, পৃঃ-৪৫
১১। পূর্বোক্ত, পৃঃ-৪৬
১২। পূর্বোক্ত, পৃঃ-৫৫
১৩। পূর্বোক্ত, পৃঃ-৫৩
১৪। পূর্বোক্ত, পৃঃ-৫৩
১৫। পূর্বোক্ত, পৃঃ-৫৩
১৬। পূর্বোক্ত, পৃঃ-৫৪
১৭। পূর্বোক্ত, পৃঃ-৫৪
১৮। পূর্বোক্ত, পৃঃ-৫৪
১৯। সনৎকুমার নস্কর সম্পাদিত 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী', রত্নাবলী, কলকাতা, ২০০৯, পৃঃ-৩৯৪
২০। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী, 'চণ্ডীমঙ্গল', পূর্বোক্ত, পৃঃ-৪০
২১। পূর্বোক্ত, পৃঃ-৩৯
২২। পূর্বোক্ত, পৃঃ-৪০
২৩। পূর্বোক্ত, পৃঃ-৪০
২৪। পূর্বোক্ত, পৃঃ-১১২
২৫। পূর্বোক্ত, পৃঃ-১১৩
২৬। পূর্বোক্ত, পৃঃ-১১৩
২৭। পূর্বোক্ত, পৃঃ-৪২
২৮। পূর্বোক্ত, পৃঃ-১১৩
২৯। পূর্বোক্ত, পৃঃ-৪২
৩০। পূর্বোক্ত, পৃঃ-১২৫
৩১। পূর্বোক্ত, পৃঃ-১২৫
৩২। পূর্বোক্ত, পৃঃ-১৫১
৩৩। পূর্বোক্ত, পৃঃ-১৬০
৩৪। পূর্বোক্ত, পৃঃ-২৯২
৩৫। পূর্বোক্ত, পৃঃ-১১০

**আকর গ্রন্থ :**

১। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী 'চণ্ডীমঙ্গল', সুকুমার সেন সম্পাদিত, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ ২০০১

**সহায়ক গ্রন্থ :**

১। সনৎকুমার নস্কর সম্পাদিত 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী', রত্নাবলী, কলকাতা, ২০০৯
২। সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার সম্পাদিত 'চণ্ডীমঙ্গল', গ্রন্থবিকাশ, কলকাতা, ২০০০
৩। ডঃ ক্ষুদিরাম দাস সম্পাদিত 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী', (প্রথম খণ্ড), দে'জ, কলকাতা, ২০০৭